'নীলদর্পণ'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা

Scanned with CamScanner

'নীলদর্পণ'-এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ থেকে বিষয়টিকে বোঝা যাক। এই নাটক যেমন আমাদরে ইতিহাস, তেমনি তার দুর্বলতাও অশিক্ষণীয় নয়

সমগ্র বাংলাদেশে নীলবিদ্রোহ আরম্ভ হলে ভীতসন্ত্রস্ত শাসকগোষ্ঠী ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভ ও নীলচাষ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নীল কমিশন ইন্ডিয়াগো কমিশন নিয়োগ করে। এর অল্পকাল পরে ঐ একই সাথে সেপ্টেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। শ্রী শশাঙ্ক শেখর বাগচী তাঁর সম্পাদিত নীলদর্পণে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "ভদ্র সমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, গল্পে উপন্যাসে নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম নীলদর্পণে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন। কৃপা করিয়া নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া। খ্যাতিহীন পরিচয়হীন সাধারণ নর-নারীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের আঘাত-প্রত্যাখাত মথিত হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন।" নীলদর্পণ প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ইংরেজি অনুবাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতকোষ চতুর্থ খণ্ডে সতীশচন্দ্র মিত্র তার যশোহর-খুলনার ইতিহাসে ও শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যে'র ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (শ্রী ভট্টাচার্য অবশ্য কথিত আছে বলে বিষয়টির উল্লেখ করেন) 'নীলদর্পণ' মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন বলে উল্লেখ করলেও বিষয়টি সম্পর্কে এখনো বোধহয় নিশ্চিত মন্তব্য করা যায় না।*

[*কলকাতার দৈনিক 'যুগান্তরে'র ২৬শে কার্তিক ১৩৮৯, (১১ই নভেম্বর, ১৯৮২) 'পাঠকের মতামতে' কলকাতা-২৯ থেকে প্রসেনজিৎ গুহ ঠাকুরতা জানিয়েছেন ৯.১০.৮২ তারিখে মাইকেল মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন, এটি মাইকেলের অনুবাদ নয়, স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তর বইয়ে (বইটির নাম পত্রলেখক উল্লেখ করেননি, হয়তো শ্রী দত্তও উল্লেখ করেননি) উল্লেখ করেছেন, রামচন্দ্র নামে পাদ্রী লং-এর এক ছাত্র বইটি অনুবাদ করেন। ছাত্রকে বাঁচানোর জন্য পাদ্রী লং নিজেই 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।]

Scanned with CamScanner

১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের চতুষ্কোণের একটি সংখ্যায় তপোবিজয় ঘোষ অনুবাদটি মাইকেলই করেছিলেন কিনা তার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি উপস্থাপন করেও এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেননি। নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের সময় অনুবাদকের নাম উল্লেখ না করে তাতে লেখা হয়– এ নেটিভ। সম্ভবত অনুবাদক স্বনামে চিহ্নিত হতে চাননি, যেমন চাননি নাট্যকার নিজেও। তাই দীনবন্ধু মিত্রের পরিবর্তে ঐ নাটকের নাট্যকার হিসেবে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনাম প্রকাশিত হয়।

রেভারেন্ড জেমস লঙ বিদেশী হলেও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে এ দেশের জন-মানুষের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। ফলে 'নীলদর্পণ' প্রকাশের আগেই তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে যেমন তাতে নীলকরদের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে গীত বিদ্রোহী কৃষকদের অনেক গানও তিনি তার ঐ পুস্তিকায় সংলকলন করেন। তাই 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হলে তার উদ্যোগে এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ এ দেশের ও ইংলন্ডের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে নীলকরদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কলকাতায় প্রধানতম বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টে এই গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক জেমস লঙের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই বিচারপতি স্যার এস, এল ওয়েলস এক বিশেষ জুরির সহায়তায় এই মোকদ্দমার রায় প্রদান করে আসামি জেমস লঙকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং এই অপরাধে তাকে এক মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লঙ সাহেবের হাতে জরিমানার অর্থ প্রদান করেন। জেমস ঐ অর্থ দিয়ে তাঁর জরিমানা পরিশোধ করে এক মাসের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। বঙ্গীয় সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারি সিটন কার ইংরেজি অনুবাদটি সহকারী মুদ্রণালয়ে ছাপানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন বলে ইউরোপীয় সমাজে তিরস্কৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

'নীলদর্পণ' প্রকাশের পর প্রায় সোয়াশ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলা নাটকও আঙ্গিক ও বক্তব্যে একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে। তবুও ঐতিহাসিক মূল্যের পাশাপাশি 'নীলদর্পণ' এখনো নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। যে নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে, এবং যে নাটক প্রকাশের ফলে তৎকালীন শাসকদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় সে নাটককে আর ঐসব বাহ্যিক লক্ষণের সাহায্যে বিচার না করে তার মৌল স্বরূপটিকে চিহ্নিত করা বোধহয় এখন অধিকতর প্রয়োজন। এই বিচারের ফলে প্রথম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শশাঙ্ক শেখর বাগচীর বক্তব্যের যথার্থ্য নির্ণয় যেমন সহজ হবে তেমনি যাবতীয় আলোড়ন সত্ত্বেও এই নাটকের গভীরে লুকানো দুর্বলতার স্বরূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারব বলে মনে হয়।

Scanned with CamScanner

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে কর্মজীবন শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ডাক বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হয়ে পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারীর পদ থেকে অপসারিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন ডাক বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থাকেন। ১৮৫৬-র মাঝামাঝি কর্ম উপলক্ষে তিনি নদীয়া ও ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হন। এই সময় নীলকরদের অত্যাচার ও অবিচার সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও যথাযথ ধারণা জন্মে। ডাক বিভাগের কাজের জন্যে অনেক নীলকুঠির সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে হতো বলে দীনবন্ধু মিত্র স্বনামে 'নীলদর্পণ' প্রকাশ না করে ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নীলচাষ সমগ্র বাংলাদেশের ওপর চেপে বসলেও যশোর, খুলনা ও নদীয়া জেলায়ই তা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল। এইসব জেলায় বেশ কিছু কনসার্নের অধীনে নীলচাষ তার সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসে। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, যশোর জেলার অন্তর্গত মোল্লাহাটি কনসার্নের অত্যাচারের ওপর ভিত্তি করে দীনবন্ধু মিত্র তার 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। 'নীলদর্পণ' রচনার এই নেপথ্য 'ঘটনাক্রম' থেকে বোঝা যায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এ নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু নীলচাষীর ওপর নির্মম শোষণ ও তার প্রতিরোধ কিংবা এর সম্ভাবনার চিত্রটি ঐতিহাসিক ও যথাযথ প্রেক্ষিত নিয়ে এই নাটকে উপস্থিত হয়নি। নাট্যকারের লক্ষ্যও সম্ভব তা ছিল না। তৎকালীন ভদ্রমানুষের রাজনীতির ধারা অনুসরণ করে তিনি আসলে নীলচাষীদের প্রতি অত্যাচারকে 'অব্রিটিশ' বলে প্রচার করে ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশের কাছে এই নাটকের মধ্য দিয়ে এ অত্যাচারের সুবিচার প্রার্থনা করেছেন। তাই নীলদর্পণ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন দীনবন্ধু মিত্র এর ভূমিকায় ন্যায়পরায়ণ ইংরেজকে তার ললাটের কলঙ্ক তিলককে বিমোচন করে তার পরিবর্তে 'পরোপকারে শ্বেতচন্দন' ধারণ করে বিলেতের মুখ রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। তাই 'নীলদর্পণ' নীলচাষের বিস্তৃত পটভূমিকে সামনে রেখে রচিত হলেও আসলে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে ভদ্র মানুষের সংকট ও তার করুণ বিবরণ ও প্রাপ্তির কাহিনী। দীনবন্ধু মিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেন এই নাটক তার মৌল ও স্বাভাবিক ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নীলচাষের ফলে সৃষ্ট ভদ্রমানুষের অপ্রধান সংকটকে এ নাটকে প্রধান করে তুলেছে তার গভীরতর অনুসন্ধান পাঠক ও দর্শককে এ নাটক সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পেতে সাহায্য করবে। এর জন্যে প্রয়োজন নীলচাষের ঐতিহাসিক সংকটকে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে ভদ্রমানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

ব্রুক এডামস তাঁর 'ডিল অব সিভিলাইজেশন এন্ড ডিকে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ইংল্যান্ডে প্রচুর যন্ত্রপাতি আবিষ্কারই শুধু ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেনি, ঐদেশে ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এসে পৌঁছবার পর ও ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রধানত ঐ যন্ত্রপাতি ও নিষ্ক্রিয় মুদ্রা সচল মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে শিল্পবিপ্লবের ফসলকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। তাই ১৬৬৪

থেকে পলাশীর যুদ্ধ অর্থাৎ ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অত্যন্ত ধীর, ভারত থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য ঐ বিপ্লবকে সহায়তা করেছিল বলে ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত এর গতি হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত ও বিস্ময়কর। একদিকে কাঁচামাল সরবরাহ ও অন্যদিকে শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষকদের পরিচালনার জন্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দাস-বাহিনীর দক্ষ পরিচালকদের দেশে আনা হয়। এর ফলে নীলকর এদেশে জমিদারে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গদেশে অধিকাংশ জমিদারই হয় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের লোভে কিংবা শরীকী প্রতিদ্বন্দ্বিকে জব্দ করার ইচ্ছায় ইংরেজকে ডেকে এনে জমি দিয়েছেন। জমিদারি চালাবার ভয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে অলস ও বিলাসী জীবনযাপন করার সুবিধা লাভের জন্যেও অনেক জমিদার জমি পত্তনি দিয়ে রাজধানী কিংবা বড় শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এ কারণেই তথাকথিত সাম্য ও স্বাধীনতার উদ্‌গাতা রাজা রামমোহন রায় ও হিন্দু ধর্মের সংস্কারক দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাদের শ্রেণি স্বার্থেই নীলকরদের সমর্থনেই এগিয়ে আসেন। কিন্তু ইংরেজ যখন অধিকতর লোভের বশবর্তী হয়ে জমিদারদের জমিজমাও বলপূর্বক দখল করতে থাকে তখন তাদের হীন স্বার্থেই জমিদাররা কৃষকদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু সংকট ও সংগ্রামের সময় তারা প্রধানত নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেন।

নীলচাষী নিগ্রো ক্রীতদাসদের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন ও শোষণের শিকার হয়েছিলেন। নিগ্রো ক্রীতদাসদের একদিকে যেমন উচ্চমূল্যে ক্রয় করা হতো তেমনি মালিকের জমিতে খাটত বলে জমির লাভ-লোকসানের বিষয়ে তাদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। অন্যদিকে নীলচাষী সামান্য দু টাকার দাদন নেয়া জমিতে চিরকালের জন্যে ভূমিদাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হতো। জমি চাষে তার নিজস্ব ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ মূল্যহীন অথচ নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল উৎপাদনে সে ছিল বাধ্য। এছাড়া রায়তদের গুদামঘরে আটকে রাখা, তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ওপর নির্যাতন করা, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, শারীরিক নিপীড়ন– এসবই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ দেশের ভূমি-ব্যবস্থায় জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী মধ্যশ্রেণির এক জটিল ও বিস্তৃত স্তর বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টুডে এন্ড টুমোরো'-তে দেখিয়েছেন, কোথাও কোথাও এই মধ্যবর্তী ধারাক্রম পঞ্চাশটি স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'নীলদর্পণে' জমিদার ও কৃষকের ভূমিকা প্রায় নেপথ্যচারীর। মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গও এ নাটকের প্রধান কুশীলব। গোলোক বসুর পরিবার এই মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নায়েব, গোমস্তারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নীলকরদের পদলেহী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে আবির্ভূত হলেও ধীরে ধীরে এরা যে মধ্যশ্রেণীর উচ্চতর বিত্তের ভাগ্যবান মানুষে রূপান্তরিত হতে চায় নাটকই তার পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে ঐ ব্যক্তিবর্গের উত্তরণের পথটিও যে

Scanned with CamScanner

তোষামোদ ও সেবাদাসের তা-ও চিহ্নিত হয় যখন ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত নীলকরের আমিন নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গৃহস্থ কন্যা ক্ষেত্রমণিকে দেখে বলে :

এ ছু..ড়ি ত মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তা লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব—।

এই সরল কিন্তু গভীর সত্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সঙ্গত কারণেই নাট্যকারের সমাজ সচেতনতায় আমরা আস্থা স্থাপন করতে চাইতে পারি। কিন্তু নাটকের ঘটনাক্রম ও পরিণতি নাট্যকারের একটি বিশেষ প্রবণতার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। নাটকে চিত্রিত দুটি পরিবারের একটি পরিবারের সঙ্গে জমি ও চাষাবাদের সম্পর্ক আত্মা ও জীবিকার। সাধু ও রাইচরণ পরিবারের দুই ভাইয়ের সঙ্গে জমির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড়-জীবন ও জীবিকা তাদের কাছে এক ও অবিভাজ্য। নাটকের অন্য পরিবার গোলোক বসুর পরিবার সম্পন্ন গৃহস্থ। ক্ষেতের চাল, ডাল, তেল, গুড়, বাগানের তরকারি ও পুকুরের মাছের অধিকারী গোলোক বসুর প্রথম পুত্র নবীনমাধব প্রজাদরদী, দীনের সেবক আর দ্বিতীয় পুত্র বিন্দুমাধব কলকাতায় থেকে ইংরেজি শিক্ষায় রত। বুঝতে কষ্ট হয় না, জমিতে না খেটেই এ পরিবার জমির যাবতীয় সুখ ভোগ করে এসেছে। সাধুচরণ কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলেও কিছুটা লেখাপড়া জানায় ভদ্র জীবন ও এ সম্পর্কিত মূল্যবোধে উৎসাহী। অন্যদিকে তার ভাই রাইচরণ শিশুর মতো সরল, ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে, ক্ষুধায় কাতর ও নীলচাষে ভীষণভাবে অনীহ কিন্তু অসহায়। তোরাপ সোজা ও সরলভাবে শত্রুকে জেনে। তাই বিশেষ বিশেষ সময়ে বাধ্য হয়ে চুপ থাকতে হলেও তার শত্রুকে সে ঠিকই আঘাত করে। 'নীলদর্পণে' নীলচাষই যদি তার যথাযথ প্রেক্ষিত নিয়ে এ নাটকে উপস্থিত হতো তাহলে তোরাপ কিংবা রাইচরণই হতো এ নাটকের প্রধান চরিত্র অথবা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধী সময় ও মানুষই হতো এ নাটকের নায়ক। কিন্তু পরিবর্তে এ নাটক যখন ভদ্রজীবনের সংকটকেই প্রধান করে তোলে তখন 'নীলদর্পণ' যে আসলে নাট্যকারের একটি বিশেষ প্রবণতার প্রকাশ তা বুঝতে দর্শক কিংবা নাটকের খুব একটা অসুবিধে হয় না।

নাটকে সাধুচরণের পরিবার স্থান পেলেও তারা প্রধানত ভদ্রজীবনকে মহিমান্বিত করার জন্যেই এসেছে। ফলে সাধুচরণ নীলচাষীর ভূমিকার পরিবর্তে নবীনমাধবের গুণকীর্তনকারীর ভূমিকাই পালন করে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক সহানুভূতির ফলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ও পূর্বে উল্লিখিত শশাঙ্কশেখর বাগচীর বক্তব্য এখন পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সাধুচরণের পরিবারই ছিল যথার্থ অর্থে নীলচাষীর পরিবার। ফলে ঐ পরিবারের ঐতিহাসিক ও বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়েই নীলদর্পণের যথাযথ স্বরূপ চিহ্নিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র গোলোক বসুর

পরিবারের মাহাত্ম্যকে স্পষ্টগোচর করার জন্যে ঐ পরিবারকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে না দিয়ে তাঁর হাতের পুতুল করে তুলেছেন। 'সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই' বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য 'নীলদর্পণ'-এর ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবেই প্রযোজ্য। তবে তিনি ও শশাঙ্কশেখর বাগচী যেমন সেই সহানুভূতি 'পীড়িত প্রজা' ও 'খ্যাতিহীন পরিচয়হীন নরনারীর' ওপর অর্পিত বলে মনে করেন তা কিন্তু সত্যি নয়। তাঁর সহানুভূতি ভদ্র জীবন ও ভদ্র মানুষের প্রতি, নাট্যকার নিজেই যে শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই যে তোরাপ ও রাইচরণে নীলচাষের যথার্থ প্রেক্ষিত উন্মোচিত নাটকে তারাই অবহেলিত। 'নীলদর্পণে' নবীনমাধবের ভূমিকাই প্রধান, যে নবীনমাধব সাধু ও রাইচরণকে নীলকরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নীলকরের দেওয়ান গোপীনাথের পরামর্শে ঐ দুই নীলচাষীকে 'পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক' এই উপদেশ দিয়ে নিজের গা বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে আসেন। তবুও নাটকে নবীনমাধবকে বীরপুরুষ ও প্রজাদরদী হিসেবে চিহ্নিত করার এক দুর্মর প্রচেষ্টা থেকে নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না।

গোলোক বসুর পরিবার মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট সম্পন্ন গৃহস্থ কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত। গোলোক বসুরা চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কারণ, এটিই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা ভদ্র। তাই চাষীদের রক্ষা করার দায়িত্বটি নবীনমাধবের কাছে এদেশের ভূমি-ব্যবস্থা ও বিদেশী শোষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে দেখা না দিয়ে বিবেচিত হচ্ছে 'পরোপকার' হিসেবে। এটি ভদ্র-জীবনের শৌখিন খেয়াল, অবসর বিনোদনের উপায়। তাই যথার্থ সংকটের সময় নবীনমাধব অত্যাচারিত প্রজাকে 'দীনের রক্ষকে'র কাছে সঁপে দিয়ে নিজে পলায়ন করেন। ভদ্র জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত গোলোক বসুর পরিবারে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এক ধরনের মোহ রয়েছে। নবীনমাধবের বিশ্বাস, 'বিদ্যা জন্মিলে মানুষ সুশীল হয়', পিতা গোলোক বসু পুত্র বিন্দুমাধবের ইংরেজি শিক্ষার গৌরব করেন আর পুত্র তার স্ত্রী সরলাকে লেখেন, 'লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি।' কিন্তু এ শিক্ষা যে স্থিতাবস্থার সমর্থক তা স্পষ্ট হয় যখন তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের রোগ কর্তৃক ক্ষেত্রমণিকে নির্যাতনের দৃশ্যে তোরাপ রোগকে মারধর করলে নবীনমাধব খ্রিস্টীয় ঔদার্যে বলেন, 'তোরাপ মারধরের আবশ্যক কি, ওরা নির্দয় বলে আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয়' কিংবা বিন্দুমাধবের চিঠি থেকে আমরা যখন জানতে পারি তাঁর 'মাতাঠাকুরান' তার স্ত্রীকে স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে নিষেধ করেছে। এ শিক্ষা অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোস ও সহাবস্থানে রাজি ও সমাজে নারীর অধিকারদানে অস্বীকৃত। অথচ এ বিষয়ে প্রজাপালক নবীনমাধব কিংবা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিন্দুমাধব মোটেও অস্বস্তি বোধ করে না। স্থিতাবস্থার সমর্থক এই ভদ্র পরিবার তাই শেষ অব্দি 'মন্দ' ইংরেজের বিপক্ষে ভালো ইংরেজের কাছে আশ্রয় ও

Scanned with CamScanner

সুবিচার প্রার্থনা করে। এই প্রবণতা যে নাটকের চরিত্রেরই শুধু নয় বরং স্বয়ং নাট্যকারেরও তা 'নীলদর্পণে'র প্রথম প্রকাশের পূর্বোদ্ধৃত ভূমিকা থেকেও বোঝা যায়। কিন্তু নীলচাষের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার ও শোষণের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক জড়িত তাকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের কাছে আবেদনের অর্থই হচ্ছে ডুবন্ত ভদ্র মানুষের খড়কুটোকে আশ্রয় করে একলা বেঁচে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করা। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই সপারিষদ গভর্নর জেনারেল নীলচাষের বিরুদ্ধে যেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন সেখানে ১৮২৩ ও ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জমির ওপর নীলকরদের স্বত্বাধিকার করা ও দাদন গ্রহণ করে নীলচাষ না করাকে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। আবার ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ১১নং আইন পাস করে ইন্ডিগো কমিশন নিয়োগ করার পর ও নীলকর নীলচাষের চুক্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারির মামলা দায়ের করতে পারত। এ থেকে বোঝা যায়, বিষয়টি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মহত্ত্বের অধীন ছিল না, সাম্রাজ্য ও শোষণের স্বার্থই তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই মানবতাবাদী পাদ্রী লঙ ও সিটন কার ঐ শক্ত খুঁটির কাছে নিগৃহীত হন।

নীলবিদ্রোহে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে লজ্জাকর। মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় নীলবিদ্রোহের কাহিনীকে অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর পত্রিকায় নীলকর আর্চিবল্ট হিলস কর্তৃক হরমণি নাম্নী এক নারীকে অপহরণের সংবাদ প্রকাশ করেন। এতে হিলস হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করে এক মানহানির মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলা চলাকালীন হরিশচন্দ্র ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে লোকান্তরিত হন। হরিশচন্দ্রের স্ত্রীকেও এ বিষয়ে নিগৃহীত হতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কলকাতাবাসী মধ্যশ্রেণীর কেউ এই বিপদের দিনে হরিশচন্দ্রের পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। নীলবিদ্রোহ থেকে তারা যেমন দূরে ছিলেন তেমনি যাঁরা এ বিদ্রোহে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উপেক্ষার।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর আগেই 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হলেও এটা নিশ্চিত যে, দীনবন্ধু মিত্র মধ্যশ্রেণীর এই ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই এ নাটকে আমরা গোপীনাথ ও আমিন চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু সেইসঙ্গে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভদ্রমানুষের প্রতি দীনবন্ধুর মোহও অত্যন্ত গভীরভাবে এই নাটকে চিত্রিত। এই মোহ থেকে জন্ম নেয় ইংরেজপ্রীতি। তাই গোলোক বসুর মোহাচ্ছন্ন স্ত্রী যখন চাষী পরিবারের বউ রেবতীর কাছ থেকে জানতে পারেন তার মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের মনে ধরেছে তখন তিনি তা বিশ্বাস করতে না পেরে বলেন: 'মগের মুল্লুক আর কি। ইংরেজ রাজ্যে কেউ না ঘির ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?' এর উত্তর দিতে গিয়ে চাষী-বউ রেবতী আসল সত্য উন্মোচন করে : 'মা চাষার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে, মরদদের কয়েদ করে, নীলদাদনে এ কত্তি পারে, নজরে ধল্লি ও কত্তি পারে না?'

Scanned with CamScanner

তবু সাবিত্রীর মোহ যায় না। পুত্রের বরাত দিয়ে তিনি বলেন : আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে। তা এরা কি সাহেব মা, এরা সাহেবের চণ্ডাল। (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)। এই মোহের জন্য ভূমিস্বার্থ ও তজ্জনিত মূল্যবোধের ঐক্য থেকে। তাই নীলবিরোধিতার মধ্যেও ভূস্বামী ও মহাজনের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এ নাটকে। গোপীনাথের মতো নিন্দিত চরিত্রের মুখ দিয়ে মহাজনদের প্রশংসা করিয়ে নেয়ার মূল কারণ এটা দেখানো যে, গোপীনাথও যেখানে এই সত্য স্বীকার করে সেখানে তা আরো কত বেশি সত্য। গোপীনাথের এ সম্পর্কিত দীর্ঘ উক্তিটি উদ্ধার করলেই পাঠকের কাছে তা স্পষ্ট হবে : 'ধর্মবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলে মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়। বৎসরান্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদসমেত টাকা পরিশোধ করে। অথবা বৎসরান্তে দরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান দেড়া বাড়িতে বা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়। ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে তিন-চারি মাস খরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশত কিংবা খাতকের অসঙ্গত ব্যয়ের জন্য টাকা কিংবা ধান বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়। বকেয়া বাকি ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না; সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাতত লোকসান বোধ হয়।... কোনো কোনো অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে।' (পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)। এই উক্তিকে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি বলে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হই যখন রাইচরণ ও নালচাষী তাদের নীলচাষে প্রবেশ করবার আগের কথা মনে করে, এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কার্ত্তাম (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) বলে উল্লাস প্রকাশ করে। কিন্তু যতটা সরলভাবে নাট্যকার মহাজন ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী বাংলাদেশে তা ততটা সরল তো ছিলই না বরং শোষণের নানা জটিল মধ্যশ্রেণীগত প্রক্রিয়া তখন এ দেশের ভূমি ব্যবস্থায় কার্যকর ছিল। নীলচাষ অবস্থার আরো অবনতির সুযোগ করে দেয়। ফলে পরবর্তীকালে কৃষকরা নীলকরের সঙ্গে জমিদারের জন্যও নীলচাষে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এ সম্পর্কে সচেতন থেকেও যে মধ্যশ্রেণীর ভদ্র অংশের প্রতি তাঁর অন্ধ আনুগত্যকে প্রকাশ করেছেন তার কারণ তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান। এর ফলে 'নীলদর্পণে'র মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর শিল্পচেতনাও হয়েছে খণ্ডিত। 'নীলদর্পণে'র প্রধান চরিত্র নবীনমাধব। বিভিন্ন চরিত্র তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভদ্র পরিবারের প্রতি নাট্যকারের মোহাচ্ছন্নতা এতটা প্রবল যে তা নাটকের বাস্তবতাকে ও পিতা সাধুচরণ বড়বাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুনে এভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে : কমিশনে প্রজার উপকার সম্ভব

বটে কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের একশত কেউটে সর্প আমায় অসময়ে একবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথুনি উনানে সুন্দরি-কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড় তাহাতে আকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পরি, অমাবস্যার রাত্রিতে হৈ-হৈ শব্দে নির্দয় ডাকাইতেরা সুশীল সুবিদ্যান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমাসুন্দরী পতিপ্রাণা দশ মাস গর্ভবতীসহধর্মিণীর উদরে পদঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্ত পুরুষার্জিত ধন-সম্পত্তি অপহরণপূর্বক আমার চক্ষ তলোয়ার শলাকায় আবদ্ধ করিয়া দিয়া লয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুঠি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু একমুহূর্তের নিমিত্তও প্রজা পালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।'

সাধুচরণের উক্তিতে দশটি নীলকুঠি স্থাপনের চেয়েও বড়বাবুর বিরহকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বড়বাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত বলে সাধুচরণের কাছে নীল কমিশনের মধ্য দিয়ে প্রজাদের মঙ্গল হলেও তার কোনো মূল্য নেই- এইসব মন্তব্যকে নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। নাট্যকার এই বিষয়ে এতটাই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন যে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নবীনমাধবের প্রজাদরদী, অন্নদাতা রূপটি বারবার প্রচার করলেও নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা মোটামুটিভাবেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ফলে নবীনমাধব নাট্যকারের সৃষ্ট আদর্শের যান্ত্রিক পুতুলে পরিণত হয়েছেন। এ কারণে ঐ চরিত্রের ভাষা ও জীবনাচরণও হয়ে উঠেছে কৃত্রিম। ফলে পিতার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হলে ঐ মামলার খরচ চালাবার বিষয়ে নবীনমাধব ও তার স্ত্রী পরামর্শ করবার সময় যখন পরস্পরকে প্রাণনাথ প্রেয়সী, হৃদয়বল্লভ, পঙ্কজনয়ন, জীবনকান্ত, বিধুমুখী, প্রণয়িনী ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে তখন পারস্পরিক এই কথোপকথন পুরো বিয়ষটির গুরুত্বকে অনেকটাই খর্ব করে দেয়। ভদ্রজীবনের সংকটকে তীব্র করে দেখাতে গিয়ে নাট্যকার গোলোক বসুর ফাঁসির দৃশ্যটিকে মঞ্চে দেখিয়েছেন। একই কারণে নাটকের শেষ দিকে গোলোক বসুর পরিবারে এক অস্বভাবিক মৃত্যু-মিছিলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। বিস্তৃত নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না বলে ঐ কারণে দৃশ্যটিকে আমরা মেলোড্যামাটিক বলেই শনাক্ত করি। কিন্তু এতসব কিছুর পরেও, নাটকের শেষাংশে নীল অত্যাচারের একটি গান যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই নাটক শেষ করে আমরা নীলচাষের যথাযথ প্রেক্ষিতটিকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে গোলোক বসুর পরিবারের সদস্যদের অপচয়জনিত মৃত্যুর কারণে তাদের জন্যে একধরনের করুণা অনুভব করি। 'নীলদর্পণ' হয়ে ওঠে ভদ্র পরিবারের ব্যক্তিগত করুণ কাহিনী।

মনে হতে পারে 'নীলদর্পণ'কে তার সময় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা হয়েছে। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের বছরই (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এটি যদিও প্রহসন তবু তৎকালীন

Scanned with CamScanner

সমাজপ্রেক্ষিত এতে যথাযথ চিত্রিত। এই প্রহসনের দুটি চরিত্র হানিফ ও বাচস্পতি দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে লালিত মানুষ। কিন্তু একটি বিন্দুতে তারা দুজনেই এসে মিলিত হয়েছে : তারা উভয়েই শোষিত। তাই লম্পট ও শোষক জমিদার ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করায় তারা দুজনেই ঐক্যবদ্ধ হয়। বাচস্পতি সংস্কৃতপ্রদাণ শব্দ ব্যবহার করে, হানিফ মুসলমান জনজীবনের। তাই বাচস্পতি মা না বলে বলে মাতাঠাকুরান, বুড়ো না বলে 'প্রাচীন' খেলাধুলার পরিবর্তে ক্রীড়া, অন্যদিকে হানিফের কাছে অত্যাচারীমাত্রই 'কাফের'। হানিফ 'কাফের' শব্দের মধ্য দিয়ে তার ক্রোধকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণত্ব চলে যাওয়ার পর বাচস্পতি এখন শোষিত সাধারণ একজনে রূপান্তরিত। ফলে তার সংস্কৃতানুগ শব্দ ব্যবহারও হয়ে ওঠে অনেক সুবোধ্য। মাইকেল জীবনাচরণ ও ভাষা ব্যবহারে কোনো তফাৎ রাখেননি। ফলে তাঁর চরিত্ররা হয়ে উঠেছে জীবনানুগ ও যথাযথ। অন্যদিকে তফাৎ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পারার জন্যে দীনবন্ধু নবীনমসাধবের ভাষা ব্যবহার ও জীবনাচরণে তাকে করে তুলেছেন এক যান্ত্রিক পুতুল। তাই নবীনমাধবের সংস্কৃতবহুল এইরকম উক্তি 'জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়?' কিংবা 'নবপ্রসূতি শজারু কিরাতে করতলগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপে এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে' আসলে তাঁর জনবিচ্ছিন্নতাকেই স্পষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে তোরাপ যখন ইংরেজ নীলকরকে 'সুমুন্দি' বলে গাল দেয় তখন তাকে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু নাট্যকার নবীনমাধবকে আদর্শায়িত করে ভদ্রজীবনকে একটি আলগা মহিমাদান করতে গিয়েই এই চরিত্রের ভাষা ও জীবনাচরণকে কৃত্রিম করে তুলেছেন। আসলে এ নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তোরাপ কিংবা রাইচরণের। কিন্তু নীলদর্পণ নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল নীলদর্পণের পটভূমিতে ভদ্রজীবনের সংকট উন্মোচন। ফলে সমগ্র বিষয়টি হয়ে উঠেছে আরোপিত ও জন-বিচ্ছিন্ন।

আমরা ভুলে যাইনি, ঢাকায় এ নাটক প্রথম অভিনীত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও এক বছরের মধ্যেই এর পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'নীলদর্পণ' দিয়েই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বঙ্গদেশের পেশাদারী নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়। 'নীলদর্পণে' যেসব নট-নটী অভিনয় করতেন তাঁদের সবসময়ই পুলিশের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হতো, পরিণামে ১৯০৮ ইংরেজ বিদ্বেষী এই অজুহাতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। তবু একশ' বছরেরও ওপর বয়েস হওয়ায়, এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নাটকটির দুর্বলতার সূত্রগুলোও বোধহয় এখন আমাদের সন্ধান করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner